ইয়াসমীন আরা লেখা*

# রবীন্দ্র ভাবনায় শিক্ষা ও সমাজ

**সারসংক্ষেপ :** *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে তিনি জগতকে দেখেছেন। জগতের মানুষের কল্যাণ কামনায় তাঁর হৃদয়-মন ব্যথিত হয়েছে। জনকল্যাণের চিন্তায় তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন। এ-সকল প্রবন্ধে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষা-ভাবনায়। যার বেশির ভাগই ছিল সমাজচিন্তামূলক। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র এ প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির আত্মিক ও মানসিকসত্তার স্বাভাবিক বিকাশ সাধিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে তাঁর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্পষ্টভাবে। এ প্রবন্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্বাধীন ও স্বাভাবিক সমাজ সৃষ্টির জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিশ্লেষণে ও তা নিরসনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশধারার উপায়ের ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ এটাকেই তিনি স্বাধীন ও মর্যাদাবান সমাজসত্তা নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে দেশমাতৃকার সম্পর্ক নিবিড় করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী। সমাজ থেকে অন্ধসংস্কার দূর করে যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞান সচেতন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির সচেষ্ট প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তথা মৌলিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে শিক্ষাসমস্যার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিরাজমান কৃত্রিম ভাব ও পদ্ধতিকে দোষারোপ করেছেন। এ সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে তিনি আদর্শবাদী ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যার প্রকৃতি চিহ্নিত করতে তিনি ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নারী সমাজের কথা ভেবেছেন; নারীর শৃঙ্খলমুক্তি তথা নারীর উন্নতির কথা ভেবেছেন। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জন্য আজও অনেকখানিই তাৎপর্যপূর্ণ। আজও ব্যক্তি এবং জাতীয় সংকটে আমরা বার বার রবীন্দ্রনাথের নিকট ফিরে যাই।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়ই তিনি তাঁর পদচারণা এবং প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ; কী কাব্যে, কী নাটকে, কী উপন্যাসে, কী ছোটগল্পে, কী প্রবন্ধে–আজও তিনি অনতিক্রম্য। সাহিত্যে তিনি দার্শনিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন।

*অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে তিনি জগতকে দেখেছেন। জগতের মানুষের কল্যাণ কামনায় তাঁর হৃদয়-মন ব্যথিত হয়েছে। জনকল্যাণের চিন্তায় তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন। এ-সকল প্রবন্ধে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষা-ভাবনায়। যার বেশির ভাগই ছিল সমাজচিন্তামূলক।

'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক লেখাটি শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। এটি 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে' তিনি পাঠ করেন ১২৯৯ সনে। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রবন্ধটি ঐ সনেই মুদ্রিত হয়। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র এ প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির আত্মিক ও মানসিকসত্তার স্বাভাবিক বিকাশ সাধিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে তাঁর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্পষ্টভাবে। এ প্রবন্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্বাধীন ও স্বাভাবিক সমাজ সৃষ্টির জন্য। তিনি বলেছেন :

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।[১]

শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ রাখলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে :

> যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না– বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।[২]

শিশু বয়সের শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার ওপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ মনোযোগ ছিল। এ স্বাধীনতাকে তিনি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবলম্বন হিসেবে গণ্য করেছেন। নিজ সমাজে এ স্বাধীনতার অভাব দেখে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন,

> বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশানো নাই।[৩]

ভবিষ্যতের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:



> তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি.এ, এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।[৪]

এ অবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দহীন শিক্ষা ও মুখস্থ বিদ্যাকে দায়ী করেছেন। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে আনন্দময় পরিবেশ না থাকাতে শিক্ষার্থীর গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তি সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। "এই মানসিকশক্তি -হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে"।[৫]

নিরানন্দ শিক্ষার বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এ সংকটের মূলে তিনি দুটি বিশেষ সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটি হলো শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টি হলো যোগ্য শিক্ষকের অভাব। রবীন্দ্রনাথের মতে : "ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। ... আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়"।[৬]

অন্যদিকে

> নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্ট্রেন্স পাস, কেহ-বা এন্ট্রেন্স ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, এ অবস্থায় প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এ শিক্ষা কেবল পরীক্ষা পাসের শিক্ষা আর চাকরি জোটানোর শিক্ষা। এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মা পরিপুষ্ট হয় না। তাঁর মতে এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ না করলেই বরং শিশুর উপকার হতো। ...যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতিজননীর ওপর সহস্র দৌরাত্ম করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত।[৮] তাঁর মতে, এ জাতীয় শিক্ষা শিশুকে 'প্রকৃতির সত্যরাজ্য' এবং 'সাহিত্যের কল্পনারাজ্য'-এ প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ করে দেয়। ফলে কখনোই তার মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হতে পারে না। প্রাপ্ত বয়সে সে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে নিজের বল ও শক্তি খাটিয়ে জীবন চলার পথে বাধা অতিক্রম করতে পারে না। নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক তুলে ধরতে পারে না। সে কেবল মুখস্থ করতে, নকল করতে তথা অন্যের অনুকরণ করতে শেখে। তার ভেতরে অন্যের অধীন থাকার প্রবণতাই রয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দু'ধরনের শক্তির কথা বলেছেন। এ দু'টো হলো 'চিন্তাশক্তি' ও কল্পনাশক্তি'। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ শক্তি দু'টোর বিকাশ ঘটছে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। সার্বিক বিচারে তিনি বলেছেন, ...

এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।[৯] এ প্রহসন রোধ করার জন্য শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনকেই তিনি সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এ সামঞ্জস্য বিধানের উপায়ও তিনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য।[১০] তিনি মনে করেন বাংলাদেশের (গোটা বাংলা ভূখণ্ড অর্থে) শিশু তথা বাঙালি শিক্ষার্থীর সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব কেবল তার মাতৃভাষা ও তার শেকড়সম্পৃক্ত সাহিত্যরস দিয়ে।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবে তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিশ্লেষণে ও তা নিরসনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রতিটি ছত্রেই তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশধারার উপায়ের ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ এটাকেই তিনি স্বাধীন ও মর্যাদাবান সমাজসত্তা নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।

রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব বরাবরই জোর পেয়েছে। তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমাজের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানচর্চার কথা বলেছেন। তিনি বিজ্ঞানচর্চাকে 'স্পল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের'[১১] মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাকে সমর্থন করেন নি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসোসিয়েশন প্রসঙ্গে ১৩০৫ সনে লেখা 'প্রসঙ্গ কথা-১' এ তিনি উল্লেখ করেছেন, 'যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই।'[১২] বিজ্ঞানচর্চা ব্যক্তি ও সমাজের সত্যদর্শনের জন্য কতখানি প্রয়োজন তা বুঝাতে তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধসংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়।[১৩] সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি বিজ্ঞানের আলো সাধারণভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানচর্চা হলেও ভিত্তির সংকীর্ণতা ও ব্যাপ্তির অভাবগত কারণ তা অধোগতি লাভ করে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞান ঘেঁষা ছাত্ররাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন।'[১৪] তাঁর মতে, বিজ্ঞানচর্চার সাথে দেশমাতৃকার শেকড়ের সম্পর্ক নেই বলে এমন ঘটে। ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে দেশমাতৃকার সম্পর্ক নিবিড় করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী। সমাজ থেকে অন্ধসংস্কার দূর করে যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞান সচেতন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির সচেষ্ট প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাঁর মধ্যে জাগরুক থাকা আধুনিক মননের প্রকৃষ্ট রূপ এটা।

আমাদের মতো কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তথা মৌলিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি বাংলাদেশে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষাকে স্বাধীন রাখতে মত দিয়েছেন।



ইংরেজ সরকারের হাতে তার দায়িত্ব দিতে সায় দেন নি। দ্বিতীয়ত, এ শিক্ষার মাধ্যমে গণমানুষকে লোকহিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন : ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি হইয়া উঠিতে পারে।[১৫]

'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন বরাবর সেটাই তিনি ধরে রেখেছেন। 'শিক্ষার সংস্কার' (১৩১৩) প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এসব ক্ষেত্রেও তিনি ইংরেজ প্রবর্তিত ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যভিত্তিক শিক্ষাপ্রণালীর সমালোচনা করেছেন।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না–আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে-ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে।[১৬]

এ প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বিকৃত ও অপরিপক্ব বিকাশ বিষয়ে তিনি বলেছেন :

> এইরূপ শিক্ষা প্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ... আমাদের ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র অবস্থার-ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোনো-না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটি ছেলেমানুষি ব্যাপার।[১৭]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন :

> নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজে জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।[১৮]

তিনি শক্তভাবে শিক্ষাব্যবস্থার এই নেতিবাচক ফলাফলের বিরোধিতা করেছেন। আর দেশের শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন :

> আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, একজন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।[১৯]

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বসমাজের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনের মানসে এবং নিজ সমাজকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার তাগিদে শিক্ষাসংস্কার প্রশ্নে স্বদেশভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বিদেশি সরকারের হাতে স্বদেশের শিক্ষার দায়িত্ব দিতে কোনোভাবেই রাজি ছিলেন না। তিনি বলেছেন :

> দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্‌ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব–অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব– ইহা নিশ্চয়।[২০]

এ মরার হাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে তিনি সমাজে 'প্রকৃত শিক্ষা' বিস্তারের কথা বলেছেন। এই প্রশ্নে তিনি সরকারের ভূমিকার বিষয়টি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি সমাজ ও সরকারকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সমাজের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষাসমস্যার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিরাজমান কৃত্রিম ভাব ও পদ্ধতিকে দোষারোপ করেছেন। এ সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে তিনি আদর্শবাদী ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যার প্রকৃতি চিহ্নিত করতে তিনি ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। তিনি ইউরোপ ও বাংলাদেশে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের একটা তুলনা করেছেন এভাবে :

> য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে–সেইখানে তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে-সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।[২১]

এ প্রক্রিয়ায় ইউরোপ বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশে আছে এবং সমাজ থেকে রস আহরণ করে তার ফল সমাজকে দান করছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটি হচ্ছে না। এদেশে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। তিনি বলেছেন :

> কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব।[২২]

এই শুষ্ক ও নির্জীব প্রক্রিয়ার কারণে শিক্ষা এদেশে সমাজে ব্যক্তির জীবন পূর্ণ করতে পারছে না। তবে রবীন্দ্রনাথ এদেশে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার হুবহু অনুকরণও সমর্থন করেন নি। য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে।[২৩]

তিনি স্বদেশ তথা স্বসমাজের মধ্যেই এর সমাধান পাওয়ার চিন্তা করেছেন। এখানে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনভিত্তিক আশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শধর্মিতা ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্টদের প্রতি তিনি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। আশ্রমে গুরু ও শিষ্যের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক, জ্ঞান বিতরণ ও আহরণে অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর অধ্যয়নকালে 'ব্রহ্মচর্যপালন' ও গুরুগৃহে বাসকে তিনি সমর্থন করেছেন। তবে এ ব্যবস্থাকে তিনি জীবনে বৈরাগ্য সাধনের উপায় হিসেবে গণ্য করেন নি। সমাজ জীবনে ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সুস্থ ভূমিকা পালনের প্রস্তুতিকাল হিসেবে গণ্য করেছেন। সংসার জীবনের টানাপোড়নে যাতে শিশুদের 'হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায়' কৃত্রিম আঘাতে বিনষ্ট না হয়, তাদের মন যাতে দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেজন্য তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে,

> ... জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।[২৪]



রবীন্দ্রনাথের মতে, এর ফলে শিশুদের পূর্ণবিকাশ ঘটে। তারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করতে পারে। শুধু তাই নয় এর ফলে শিশুদের নবাঙ্কুরিত নির্মল ও সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

শিশুর আদর্শ শিক্ষার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যের সাথে প্রকৃতি সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে,

> অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ জানতেন বৈষয়িক লোকজন তাঁর এ মতামতে সায় দেবেন না। তারপরও তিনি তাঁর নিজের মত থেকে দূরে সরে যান নি। কারণ তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি আবার বলেছেন :

> খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।[২৬]

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। শিশুদের ওপর প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মোহনীয়রূপ কী রকম সুফল বয়ে আনে তা প্রবীণ অভিভাবক ও বিষয়ী মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন :

> বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও– তাহাদিগকে এই ভূমির আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতিময় অঙ্গুলির দ্বারা উদঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাসনকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিন করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাসাতে চঞ্চল নানাবর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই;... ।[২৭]

তিনি প্রচলিত বিদ্যালয়গুলোকে বিশেষত শহরের বিদ্যালয়গুলোকে কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিশুদের শিক্ষাকে আনন্দময় করার লক্ষ্যে এ জাতীয় বিদ্যালয়কে পরিহার করে প্রকৃতির কোলে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর মতে :

> অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।[২৮]

'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'আবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিতেও তিনি উদার প্রকৃতির সংশ্রবে ব্রহ্মচর্যা ও কৃচ্ছতাপালনের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রকৃতির কোলে শিক্ষার আয়োজন করার উদ্দেশ্যের এক দিক হলো শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ; অন্যদিক হলো প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক ধারা শিশুকে অনুধাবন করানো, যাতে সমাজের স্বাভাবিক বিকাশধারার প্রতি সে যেন অনুরক্ত হয়। সমাজজীবনে সে যেন কৃত্রিম ভূমিকা পালন না করে। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য এ জাতীয় ব্যক্তি সমষ্টি সমন্বয়ে সুস্থ, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রস্ফুটিত সামাজিক ধারা সৃষ্টি করা।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আদর্শবাদ ও প্রকৃতিবাদ শুধু তাত্ত্বিক বিষয় ছিল না। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থনৈতিক অসচ্ছল এবং ঋণগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বোলপুরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। এ বিদ্যালয়ে তিনি অকৃত্রিম আদর্শ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সম্মিলনে তপোবনের আবহ সৃষ্টির প্রয়াস পান।

প্রাচীন গুরুগৃহ বাসের সমস্ত নিয়ম, বিলাসিতা বর্জিত পরিবেশ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত শিক্ষার্থী এবং তেমনি উপযুক্ত শিক্ষক ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় এতকাল অনুদ্ঘাটিত কর্মযোগের উদ্বোধন ঘটাতে, সেই সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য ছিল শিশুচিত্ত যেন পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ববোধে উদীপ্ত হয়।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের যে চিন্তা ও মনোভাব তা ছেলেবেলায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। তাঁর নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের যে অভিজ্ঞতা তা তিনি 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)-তে বিশদ বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট ছেলেবেলার শিক্ষার সবচেয়ে মধুর স্মৃতিটি হলো, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। অনেক বয়স পরেও জীবনের অনেক স্মৃতি ছাপিয়ে কেবল এটাই তাঁর মনে পড়েছে। কারণ তিনি বলেছেন যে তাঁর জীবনে এটাই ছিল আদিকবির প্রথম কবিতা। তাঁর দার্শনিক মনে গেঁথে ছিল ছন্দ, মিল, স্বতঃস্ফূর্ততা আর গতিশীলতা, যেটি তিনি সব সময় প্রকৃতির অকৃত্রিম স্বাভাবিক রূপের মধ্যে দেখেছেন। এটাকেই তিনি ধারণ করেছেন মনে প্রাণে। এটাই তিনি খোঁজ করেছেন সব সময় সব জায়গায়। নিজেদের পারিবারিক বিদ্যালয়ে অতি শৈশবকালে তাঁর এই যে পাওয়া এবং পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনে তা আর না পাওয়া তাঁকে প্রচলিত শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন করে তোলে। এ না পাওয়ার মর্মবেদনা তিনি সব সময় অনুভব করেছেন। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন এমন শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্টির যাতে শিশুরা তা পায়।

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সের আগেই কান্নার জোরে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'-তে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানকার কঠোর শিক্ষাপ্রণালী তাঁকে ব্যথিত করে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আদৌ শিক্ষা হয় কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দেহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :



> সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদদিগের আলোচ্য।[২৯]

এরপর তিনি 'নর্মাল স্কুল'-এ ভর্তি হন। কিন্তু এ স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর সুখকর নয়। এ বিদ্যালয়ের একঘেয়েমি ব্যাপারগুলো তাঁর নিকট অর্থহীন ও দুর্বোধ্য মনে হতো। কত তাড়াতাড়ি বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিতে পারবেন সেটাই ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। শিক্ষকদের অমার্জিত ব্যবহার তাঁকে পীড়া দিত, বিদ্যালয়ের পড়াশোনা থেকে মন দূরে সরিয়ে রাখত। এ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম।[৩০]

নর্মাল স্কুলের পর রবীন্দ্রনাথকে 'বেঙ্গল একাডেমি' নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি করা হয়। আগের স্কুল দু'টোর তুলনায় এখানে তিনি কিছুটা বেশি স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পেলেও বিদ্যালয় যে বিদ্যালয়, তাঁর ভাষায় : 'হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল'[৩১] একথাটি তাঁর মধ্যে জাগরুক ছিল। এখানেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার চিরাচরিত বিষয়টি লক্ষ করেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনে তাঁর মনকে বিরাগভাজন করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো–ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত–অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার এই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।[৩২]

বিদ্যালয়ের কঠোর শাসন ও নিষ্প্রাণ পরিবেশ বারবার রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয় ছাড়া করেছে। তাঁর যে শিক্ষা তা ঘটেছে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও চেষ্টায়। আর এক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারে বিরাজমান শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ তাঁকে সহায়তা করেছে। পারিবারিক পরিবেশে গৃহশিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে তিনি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। অঙ্কন, জিমন্যাস্টিক্স, সংগীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়েও তাঁর হাতেখড়ি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার যে বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিশীল ভাব তাতে এ জাতীয় শিক্ষা পরিবেশের অবদান অনেকখানি। তবে তিনি এ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও ফাঁক দেখেছেন, কৃত্রিমরূপ আবিষ্কার করেছেন। জীবনের শেষদিককার লেখা 'ছেলেবেলা'-তে (১৩৪৪) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে:

> মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র যতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুরখু হয়ে থাকবার মত বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ সর্বদা মুক্ত পরিবেশ চেয়েছেন, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পুরো অধিকার চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই লক্ষ্যহীন শিক্ষার কথা চিন্তা করেন নি। বরঞ্চ তিনি লক্ষ্যের কথাই আগে ভেবেছেন। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তাঁর লক্ষ্যগুলো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সমাজের চাহিদার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সমাজের কোথাও তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য রেখা দেখতে পান নি, 'আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই।'[৩৪]

এজন্য রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের দেশে শিক্ষায় প্রকৃতধারা সৃষ্টি হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, যে ধারার শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে না।

> এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব–কেমন করিয়া শিখিব– শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে'–তখন আমার এই কথা মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।[৩৫]

বস্তুত, 'আমরা কী হইব' তা সমাজের চাহিদা থেকে নির্ধারিত হয়। সমাজ থেকে ডাক না আসলে তা ঠিক হয় না, অর্থাৎ মানুষের লক্ষ্য স্পষ্ট হয় না। ফলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কিছু হয়ে ওঠার তাগিদ সৃষ্টি হয় না। তাঁর মতে :

> চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ে ত্যাগে টানিতেছে না–উঠা-বসা খাওয়া ছোঁওয়ার কতকগুলো কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলেছেন : আমরা কোথায় আছি, কোন দিকে চলিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক।[৩৭]

আবশ্যক এজন্য যে তাতে শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে ও শিক্ষার সঠিক প্রণালী সৃষ্টি করে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশসাধন করা চলে। এখানে সমাজের চাহিদা তথা সমাজের লক্ষ্য মাফিক সমাজের বিকাশ সাধনের উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষাকে গণ্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে 'ছেলে' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। এতে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তিনি নারীদের শিক্ষার জন্যে নীরব ছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' (১৩২২) শীর্ষক নিবন্ধ থেকে। নারীশিক্ষা নিয়ে সমাজে পুরুষদের মধ্যে বিতর্ককে রবীন্দ্রনাথ পুরুষদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন। এতে নারীর প্রকৃত স্বার্থ দেখতে পান নি। তিনি নারীশিক্ষার কথা বলেছেন নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিক থেকে, নারী কতখানি পুরুষের বশে থাকবে কিংবা কতখানি পুরুষের সমকক্ষ থাকবে সেদিক থেকে নয় 'নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে ...'[৩৮]

তিনি নারী শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন সর্বজনীন মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকেও। তাঁর মন্তব্য :



> বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।[৩৯]

তবে তিনি পুরুষ ও নারীর শিক্ষার ধরন-প্রকৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা বিভেদের পক্ষে মত দিয়েছেন। 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' অর্জনে নারী পুরুষে কোনো পার্থক্য থাকা ঠিক নয়, কিন্তু 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র ক্ষেত্রে নারী পুরুষের শিক্ষার পার্থক্য থাকা সমীচীন বলে তিনি মনে করেছেন।[৪০] নারী ও পুরুষের শরীরের ও মনের প্রকৃতির যে পার্থক্য তাকেই এখানে তিনি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। এ যুক্তির বিরোধিতা করে যারা নারীর সমকক্ষতার কথা বলেছেন তাদের সে আচরণকে তিনি 'নিতান্তই ক্ষোভ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নারী মনের প্রকৃতিতে ভালোবাসার যে নিগূঢ়রূপ বিরাজমান রয়েছে তাকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। নারী 'মা' হিসেবে 'স্ত্রী' হিসেবে 'মেয়ে' হিসেবে সমাজে যে ভালোবাসা বিতরণ করে সমাজের জন্য তা খুবই প্রয়োজন। তার ব্যত্যয় ঘটলে সমাজ টেকে না এটাকেই তিনি সবার ওপরে তুলে ধরেছেন।

সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। যেখানে নারীশিক্ষার বিরোধিতা লক্ষ করেছেন তার প্রতিবাদও করেছেন। নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্র (৬ ভাদ্র, ১৩২৩) থেকে জানা যায় যে, সুরুলের বাড়িতে খুব ভালো রকম একটি মেয়েস্কুল খোলার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। এমনকি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা এক পত্রেও (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) তিনি এ জাতীয় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, একদা আশ্রমের নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে। মহাত্মা গান্ধী যখন মেয়েদের ইংরেজি পড়ার বিপক্ষে কথা বলতেন তখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সহশিক্ষা বা সহ - অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রহৃদয়ে কোনো সংশয় ছিল না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের (১৯১৮) পর ১৯১৯ সালে মেয়েদের বোর্ডিং খোলা হয়। এতে করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নারী সমাজের কথা ভেবেছেন; নারীর শৃঙ্খলমুক্তি তথা নারীর উন্নতির কথা ভেবেছেন।

কালান্তর-এ 'নারী' (১৩৪২) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি নারী সমাজকে উদ্দেশ করে বলেছেন : তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী।[৪১] তিনি নারী সমাজকে আহবান করেছেন এভাবে :

> সামনে আসছে নূতন সৃষ্টি যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে-এমন কি, না আসতেও পারে কিন্তু যোগ্যতা-লাভের কথা সর্বাগ্রে।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার সামগ্রিক প্রশ্নে মাতৃভাষাকে সব সময় সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষার অত্যধিক ব্যবহারকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বরাবর গণ্য করেছেন।

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সমাজের ভূমিকার বিষয় আবারও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়।'[৪৩]

শিক্ষাকে জৈব হিসেবে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য নানা দিক থেকে বিচার্য। প্রথমত, শিক্ষা জৈব বলে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ভাষাগত বাহন দিয়ে শিক্ষাকে আত্মস্থ করানো, মনন, চিন্তা ও হৃদয়ে ধারণ করানো সম্ভব হয় না। মাতৃভাষাই এখানে একমাত্র বাহন। তাই তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন। এখানে বিশেষভাবে বলেছেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেন; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব।'[৪৪] দ্বিতীয়, শিক্ষা জৈব বিষয় বলে এর বিকাশ বাইরে থেকে ঘটানো সম্ভব নয়। সমাজের অভ্যন্তর থেকেই বিকাশ ঘটানো হয়।

> অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নীচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হ'য়ে উঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু।[৪৫]

এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে শিক্ষায় ইংরেজ প্রবর্তিত অভিসেচনক্রিয়াকে সমর্থন করতে পারেন নি। শিক্ষাবৃক্ষের জন্য গোটা সমাজ রসসেচন করবে এটাই তাঁর মত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য, তাকে শতবার ধিক্কার দিই।[৪৬]

স্বদেশ ভাবনা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের প্রধান দিক। স্বদেশের মানুষ, মাতৃভাষা, স্বসমাজ বার বার তাঁর শিক্ষাবিষয়ক লেখা ও চিন্তায় এসেছে। কিন্তু তিনি যে উগ্র স্বদেশি বা উগ্র জাতীয়তাবাদী নন তারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন। বিশ্বসমাজের সঙ্গে স্বসমাজের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা, বিশ্বের মানুষের সঙ্গে স্বদেশের মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা তাঁর শিক্ষাদর্শনের একটি বিশেষ দিক।

কাল প্রবাহের সঙ্গে সমাজ প্রকৃতিরও যে পরিবর্তন ঘটে সে উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাকে জাতিগত আভিজাত্যের সংকীর্ণ দেওয়ালের মধ্য আবদ্ধ না রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। বিদ্যাচর্চাতে বিশ্বময়তা সৃষ্টির কথা বলেছেন। 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন :

> একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যা-সমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।[৪৭]



মূলত বিশ শতকে দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিদ্যার যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার সঙ্গে এ দেশের বিদ্যার সংযোগ না ঘটলে, আদান-প্রদান না ঘটলে আমরা যে শিক্ষা-দীক্ষায় নিরন্তর পেছনে পড়ে থাকব-এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্য তিনি নিজ দেশে একটা বড় ক্ষেত্রের প্রত্যাশা করেন।

> অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।[৪৮]

ভারতবর্ষে বিদ্যার নদী বৈদিক, পৌরণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এ চারটি শাখায় প্রবাহিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এর সঙ্গে মুসলিম বিদ্যা এসে মিশেছে। তিনি বলেছেন :

> বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান।[৪৯]

এর সঙ্গে অবশেষে ইউরোপীয় বিদ্যার প্লাবন ঘটেছে। এ সবেরই একটি সমবায় সৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। 'অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনের বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।'[৫০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশে দেশে রাজনৈতিক দিক থেকে দানা বেঁধে উঠা উগ্র জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করেছেন। তিনি 'পলিটিক্যাল ঐক্য'–এর চেয়ে আরও মহত্তর ঐক্যের কথা চিন্তা করেছেন। আর 'সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য।'[৫১]

এরূপ ঐক্যকেই তিনি ঐক্যের 'শাশ্বত ভিত্তি' হিসেবে গণ্য করেছেন। একেই সত্য 'ঐক্য চিত্তের ঐক্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতবর্ষেও এই ঐক্যকেই তিনি রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়ে বড় করে জানার জন্য বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষায় ত্রুটির কারণে এমনটি হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন :

> দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ–ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে।[৫২]

এখানে তিনি শিক্ষার ঐক্য সাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভেদ দূর করে মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসও এখানে বিধৃত। বস্তুত বিদ্যাসমবায়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের মানুষের আত্মার ও চিন্তার সমন্বয় বিধানের কথা বলেছেন। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বন্ধন সৃষ্টির কথা বলেছেন।

'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮) প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বন্ধন সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করতে বলেছেন। কারণ তাতে নিজের ভালো হয় না। পেছনে পড়ে থাকা ছাড়া সামনে এগুনো যায় না। নিজের ভাণ্ডার তাতে খালি হতেই থাকে। তিনি বলেছেন:

> ... এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে।[৫৩]

এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জীবনের মিলনের কথা বলেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম শিক্ষার মিলন কামনা করেছেন। উগ্র মানসিকতার বশবর্তী হয়ে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন তিনি। তিনি ঘোষণা করেছেন, এ জাতীয় 'স্বজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।'[৫৪] শিক্ষাকে এক্ষেত্রেও তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্র স্থাপনের উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন। 'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।'[৫৫] এভাবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বমানবের মহামিলনের প্রবক্তা হিসেবে দেখি।

১৩৩০ সন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে আরও নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনেক ভাষণও দিয়েছেন। তবে এ পর্যায়ে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনে প্রয়োগবাদের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর বিশেষত্ব হলো বাংলার পল্লি সমাজের উন্নয়নে শিক্ষা বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন। এ কারণে ১৩২২ সনে তিনি 'পল্লী উন্নতি' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

১৩৩০ সনের পর পল্লি বিষয়ে তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে 'পল্লী প্রকৃতি' (১৩৩৫), 'উপেক্ষিত পল্লী' (১৩৪৫), 'পল্লী সেবা' (১৩৪৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় ১৩২৯ সনে (খ্রি: ১৯২২) তিনি 'শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠন বিভাগ' গড়ে তোলেন। ১৩৩১ সনে (খ্রি: ১৯২৪) প্রতিষ্ঠা করেন 'পল্লী বিদ্যালয়' বা 'শিক্ষাসূত্র'। পল্লিবিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে পল্লির সমস্যা নিরসনে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে চিন্তা ভাবনা করেছেন। নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করার কথাও বলেছেন। একটি প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বলেছেন :

> আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি।[৫৬]

এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের তিনি যথাযথ প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনীর গুরুত্ব অনুভব করেন। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তাঁর পরিকল্পনা হলো :

> যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিত মত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল সে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে।[৫৭]



গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন বাদে বাংলার উন্নয়ন ভাবা যায় না। যে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে ভেবেছিলেন ডিগ্রি অর্জন তথা জীবিকার বা চাকরির উপায় সন্ধান কখনো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না, তাঁকেই মেনে নিতে হয়েছে ভারতবর্ষের দরিদ্র, ভদ্র সকল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য সাংসারিক দায়ভার গ্রহণের প্রয়োজনে পরীক্ষা পাস বা ডিগ্রি আহরণের প্রয়োজনীয়তা। এজন্য তিনি তাঁর শ্রীনিকেতন, পল্লি বিদ্যালয় বা শিক্ষাসূত্র এর মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিজেই উন্মুক্ত করেছেন জীবিকা উপার্জনের পথ। বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা, কাঠের ও চামড়ার কাজ, বয়ন ও কারুশিল্পের ওপর। টেকনোলজিকে তিনি করতে চেয়েছেন গ্রামভিত্তিক। কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষের কথা স্মরণ রেখে তিনি নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায়। সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কর্ষিত হয়েছে শিলাইদহ সুরুলের মতো প্রত্যন্ত পল্লি অঞ্চলে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৌন্দর্য ও আনন্দের অন্বেষণে নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষায় সবসময় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে প্রয়োগবাদী চিন্তার বিশেষ ঘনীভবন ঘটে ১৩৩৭ সনে (১৯৩০ খ্রি:) রাশিয়া ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে। ১৩৩৮ সনে রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থে তিনি রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ফলাফলের নানাদিক তুলে ধরেন। রাশিয়াতে পৌঁছেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। কারণ 'আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।'[৫৮]

রাশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি সে দেশের শিক্ষার কাঠামো ও প্রকৃতি বিষয়ে যত পরিচিত হয়েছেন ততই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি যেমন শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন সেখানে অনেকখানিই তাঁর দেখা পেয়েছেন। 'এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।'[৫৯]

তিনি তাঁর শ্রীনিকেতনে এ ধরনের শিক্ষাই আশা করেছেন। এজন্য রাশিয়ায় তাঁর কর্মীদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের চোখে রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার একটা মস্ত গলদ ধরা পড়ে।

> সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে–কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না–সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।[৬০]

রবীন্দ্রনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এটি অনুভব করেছিলেন। তিনি এখানে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সাথে সমাজসত্তার বিকাশের পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব লক্ষ করেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষা ব্যক্তিকে যতখানি বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, সমাজ কাঠামোকে ততখানিই কঠোর আবরণ দিয়ে মজবুত করা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

রাশিয়া থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন অজ্ঞতা-অন্ধতা-কুসংস্কার পীড়িত স্বদেশের জন্য এ পর্যায়ে শান্তিনিকেতনের চেয়ে শ্রীনিকেতনের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ, কর্মপদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তার উপযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক সকল লেখা ও অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রায়োগিক দিক কমবেশি ওপরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদর্শিক, প্রকৃতিধর্মী ও মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিও মেলে ধরেছেন। এ সবের মধ্যে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ' (১৩৩৯),'শিক্ষার বিকিরণ' (১৩৪০), 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' (১৩৪২), 'ছাত্রসম্ভাষণ' (১৩৪৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' অভিভাষণে (পরে লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহ্যচ্যুতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূর্ব ঐতিহ্যধারা (নালন্দা-বিক্রমশিলা-তক্ষশিলায় বিদ্যমান) থেকে দূরে সরে এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাধারা। যেখানে রয়েছে অনুকরণের প্রাধান্য। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি 'প্রাণের জিনিস নয়, শখের জিনিস'[৬১] হিসেবে অভিহিত করেছেন। ফলে তা সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ফেলছে। তাতে বিদ্যা আর চিত্তের সম্মিলন ঘটছে না। 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর তীব্র নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘকার থেকে প্রচলিত ভারতবর্ষের,বিশেষত বাংলাদেশের 'স্বৈচ্ছিক' জনশিক্ষার সঙ্গে সমাজের নাড়ির টানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।[৬২] এ শিক্ষার স্থলে আধুনিক শিক্ষার দাবি নিয়ে যে শিক্ষার প্রচলন ঘটেছে ব্রিটিশ বাংলা তাকে তিনি প্রকৃত আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করতে পারেন নি। তাঁর মতে এ শিক্ষার উৎপত্তি ও আকর্ষণ শহরকে কেন্দ্র করে। এ শিক্ষার ফলাফল থেকে গ্রাম বঞ্চিত।

> শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্ড আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাকে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ... কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হলো সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-শীতলা, সেই খানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।[৬৩]

এ শিক্ষা দিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এটাকেই তিনি 'শিক্ষায় পরধর্ম' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর মাধ্যমে যে কল্যাণসাধন হবে না তা নিশ্চিত করে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোনো সভ্য দেশেই এই রকম অবস্থা বিরাজ করছে না বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। এ জাতীয় শিক্ষা সর্বজনীনরূপ পরিগ্রহ করার ক্ষমতা রাখে না বলে তা সমাজের একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। এর মাধ্যমে সমাজের শ্রেনিবিভেদ ঘটছে, সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অসাম্য যারা শিক্ষা লাভ করতে পারছে তারা যে পরিমাণে নিজেদেরকে বড় মনে করছে, সেই পরিমাণে অন্যদেরকে ছোটো ভাবছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হলো তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল;... ইংরেজি শিখে যারা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব সাধারণের সঙ্গে, দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।[৬৪]



বস্তুত শিক্ষালাভ করে ব্যক্তি তার নিজের ও অন্যের মঙ্গল কামনা করবে, মঙ্গল সাধন করবে এটাই ছিল তাঁর কাম্য।

রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের শিক্ষা' (১৩৪৩), 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪), 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮) এবং অন্যান্য লেখা বিশেষত শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক লেখায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যক্তি প্রসঙ্গ এসেছে।

বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে বাংলাদেশের ও বাঙালি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূল্য কতখানি-এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অনেকদিন থেকেই তার পক্ষে জবাব দেওয়ার যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, আমাদের সমাজে আজ আদর্শহীনতা গভীরভাবে বিরাজমান। ব্যক্তিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে গোষ্ঠীস্বার্থ তথা সমাজস্বার্থ। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা আদর্শহীনতার এই সর্বনাশা করাল গ্রাস থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত, আমাদের রাষ্ট্রীয় তথা নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ কৃত্রিমতার ছাপ স্পষ্ট। বিকৃত মানসিকতা, খণ্ডিত রাজনৈতিক চেতনাবোধ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কৃত্রিম উপায়ে খণ্ডিত এবং চণ্ডতাপ্রবণ পশ্চাৎমুখী এক জাতীয়তার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেছে সন্ত্রাস, দলীয় রাজনীতির অসাধু ব্যবসা। ফলে আজ শিক্ষকের পেশাগত আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, আর শিক্ষার্থীর নির্মল অধ্যবসায় থেকে দূরে সরে যাওয়ার নেতিবাচক ধারা বয়ে চলেছে। এখন ক্রমে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে "দানে গ্রহণে আনন্দস্রোত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড় পরিচয় ও বন্ধনধারা, শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সকল অংশের চিত্তের যোগ, শিক্ষার্থীর ভাষার সঙ্গে শিক্ষার ভাবের মিল। তৃতীয়ত, প্রকৃত সংস্কৃতিমান মানুষের সংখ্যা সমাজে কমে আসছে। বহুমুখী অপসংস্কৃতিয়ানের (diculturasation) ধারায় জাতি খেই হারাতে বসেছে। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন মানুষের বিপরীত ধারার মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে যাদের মধ্যে উদ্ধারের বিনয়কৌশল বেশি, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেয়ে নিজেকে হেয় করার প্রবণতা বেশি। চতুর্থত, গোটা দেশ জুড়ে আজ চলছে মনুষ্যত্বের সংকট। এই মনুষ্যত্বহীনতার ফলে সমাজে তীব্রভাবে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গ বিভেদ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং রাহাজানি ও ধর্ষণের মতো অন্যান্য মারাত্মক সব অপরাধ। পঞ্চমত, সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহের সম্মুখীন হচ্ছে। ষষ্ঠত, আজও আমাদের দেশে শহর-গ্রাম সম্পর্ক তীব্রভাবে নেতিবাচক। জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান। সর্বোপরি সমাজে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত প্রসারের ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাবিধ সংকট বিদ্যমান রয়েছে।

এ রকম আরও অনেক দিক তুলে ধরা চলে যে সবের পটভূমিতে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জন্য আজও অনেকখানিই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মৃত্যু হয়েছে (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) অনেক বছর হলো। আজও ব্যক্তি এবং জাতীয় সংকটে আমরা বার বার রবীন্দ্রনাথের নিকট ফিরে যাই। শুধু আমাদের জন্য নয়, গোটা বিশ্বসভ্যতার জন্যই তা সত্য। কতখানি কখন নেওয়া প্রয়োজন, সেটা আপেক্ষিক বিষয়, সব সময়ই যে কিছু নেওয়া প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ 'ব্যক্তিমানুষ' যতদিন থাকবে ততদিনই 'মানব সমাজ' থাকবে। আর মানবসমাজ ও সভ্যতার সংকটে মনুষ্যত্বের আদর্শ তুলে ধরাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সমাজ দর্শন এই শিক্ষাই আমাদের দিচ্ছে।

## তথ্যসূত্র


১. 'শিক্ষার হের ফের', শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৫৬৫
২. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৫
৩. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৪. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৫. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৬. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬-৬৭
৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৭
৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭০
১০. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭০
১১. 'প্রসঙ্গ কথা' পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৪
১২. পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৪
১৩. পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৪-১৫
১৪. পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৫
১৫. 'স্বাধীন শিক্ষা' পূর্বোক্ত পৃ: ৭২৩-২৪
১৬. 'শিক্ষা সংস্কার' পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৪
১৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৪-৭৫
১৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৫
১৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৫
২০. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৫-৫৭৬
২১. 'শিক্ষাসমস্যা' পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৭-৫৭৮
২২. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৮
২৩. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৮
২৪. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৯-৫৮০
২৫. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮১
২৬. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮১
২৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮১
২৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮২
২৯. 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭, পৃ: ৪১৭
৩০. পূর্বোক্ত পৃ: ৪২২
৩১. পূর্বোক্ত পৃ: ৪৩৩
৩২. পূর্বোক্ত পৃ: ৪৩৩
৩৩. 'ছেলেবেলা' রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৭ পৃ : ৭১১
৩৪. 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলী পূর্বোক্ত পৃ: ৬৯৯





৩৫. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০০
৩৬. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০০
৩৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০০-৭০১
৩৮. 'স্ত্রীশিক্ষা', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, শোয়াইব জিবরান, সংবেদ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা পৃ: ৬৯
৩৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৬৯
৪০. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০
৪১. 'নারী', কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৭ পৃ: ৬২৫
৪২. পূর্বোক্ত পৃ: ৬২৫
৪৩. 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯
৪৪. পূর্বোক্ত পৃ: ১২২
৪৫. পূর্বোক্ত পৃ: ১২১
৪৬. পূর্বোক্ত পৃ: ১১৯
৪৭. 'শিক্ষাসমবায়', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯২
৪৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৯২
৪৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫০. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫১. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫২. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫৩. 'শিক্ষার মিলন', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত, পৃ : ৯৪
৫৪. পূর্বোক্ত পৃ: ১০০
৫৫. পূর্বোক্ত পৃ: ১০০
৫৬.'পল্লীর উন্নতি', পল্লী প্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৭ পৃ : ৩৫৮
৫৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৩৫৮
৫৮. 'রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৭ পৃ: ৫৫৫
৫৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৫৬
৬০. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৫৬
৬১.'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টাবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪০২ পৃ: ৪৪০
৬২. 'শিক্ষার বিকিরণ' রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত পৃ: ১১২
৬৩. পূর্বোক্ত পৃ: ১১২-১১৩
৬৪. পূর্বোক্ত পৃ: ১১৪